বাংলাদেশে থাকতেই চেয়েছিলেন

কামার ইব্রাহিম

বাংলাদেশ হকি দলের কোচ হিসেবে পাকিস্তানি হকি খেলোয়াড় কামার ইব্রাহিম গত বছর সেপ্টেম্বরে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এর মাসখানেকের মধ্যেই ভারতকে হারিয়ে কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশকে প্রথম চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয় তাকে এনে দিয়েছিল 'জাতীয় হিরো'র মর্যাদা। সেই কামার গত মাসে হঠাৎই পদত্যাগ করেছেন। তার পদত্যাগের নেপথ্য কাহিনী অনুসন্ধান করেছেন খাইরুল আমিন তুহীন

এক সকালে পত্রিকার পাতা খুলতেই চমকে গেলেন দেশের বর্তমান ও সাবেক হকি খেলোয়াড়, দেশীয় কোচ এবং হকি প্রেমিকরা। গত ১৩ আগস্ট ২০ দিনের ছুটিতে পাকিস্তানে ফিরে গেছেন কামার ইব্রাহিম, সঙ্গে গেছেন ট্রেনার স্বদেশী এরশাদ হায়দার। যাওয়ার আগে ডাকযোগে ফেডারেশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের লালপত্র, মানে পদত্যাগপত্র। পরে ই-মেইলও করেছেন। কারণটা গতানুগতিকই দেখিয়েছেন, পারিবারিক অসুবিধা। হকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগই এ কারণে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাদের অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা এখনো জবাব খুঁজছেন। প্রায় মুমূর্ষু হকি নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল যে ব্যক্তিকে ঘিরে, তাকেই বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন একতরফাভাবে দোষ দিয়ে যাচ্ছে। চলছে ফেডারেশন কর্মকর্তাদের হম্বিতম্বি। 'জাতীয় হিরো' অবলীলায় হয়ে গেলেন 'জাতীয় ভিলেন'। কিন্তু যিনি চলে গেলেন সেই কামারের কথাটা জানলো না কেউ!

অনেক দিন থেকেই অবশ্য শোনা যাচ্ছিল, কামারকে দেওয়ার মতো কাজ নেই। প্রশিক্ষণ শিবির করার মতো ফান্ড নেই। নেই আরো অনেক কিছু। আর এতোসবই যদি থাকবে না তাহলে তাকে আনাই বা হলো কেন? সেই অনেক নেই-এর ঘেরাটোপে যে ৮ মাস বকেয়া পড়ে গিয়েছিল দুই পাকিস্তানির বেতন, তাই বা কে জানত! এক সময় বিশ্ব টার্ফ কাঁপানো হকি খেলোয়াড়কে যতটুকু সময় বাংলাদেশ পেয়েছে, ততটুকু সময় কীভাবে রাখা হয়েছে তাকে? যথাযথ মর্যাদা কি পেয়েছেন? চুপচাপ কেন এই চলে যাওয়া?

খেলোয়াড়ি জীবনে দারুণ দাপিয়েছেন কামার ইব্রাহিম। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলা এই রাইট উইঙ্গার ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন ৩৪টি। বিশ্বকাপে রূপা জিতেছেন, দুটি অলিম্পিকের একটিতে ব্রোঞ্জ। টানা ৫টি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলে দুটি রুপা এবং ১টি ব্রোঞ্জ তার অর্জন। এশিয়াডেও একবার সোনা জিতেছেন। খেলোয়াড়ি জীবন শেষে ৩৭ বছরের এই সুপারস্টার হকিতে গ্রেড ওয়ান কোচিং করেছেন। পাকিস্তান হকি একাডেমিতে সহকারী কোচ ছিলেন। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে মাত্র ২ হাজার ডলার মাসিক বেতনে বাংলাদেশ হকির ডিরেক্টর অব কোচিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। দেশে নিজের ব্যবসা, পিআইএ'র চাকরি ফেলে এসে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন ২০০৬ সালের কাতার এশিয়াড পর্যন্ত। তার সঙ্গে এসেছিলেন ট্রেনার এরশাদ হায়দার। হকির প্রথম বিদেশী কোচ, তাও বড় তারকা। বিদেশী কোচের জন্য ডাচ্-বাংলা ব্যাংক দুই বছরে ৩৫ লাখ টাকার স্পন্সর হয়েছিল। বাংলাদেশে অবহেলিত খেলাটি এবার প্রাণ পাবে ভেবে যাদের হৃদয় দুলে উঠেছিল, তারা এক মাস পর আরো আশাবাদী হয়ে উঠলেন। ঢাকায় আয়োজিত ৫ জাতি অনূর্ধ্ব-২১ চ্যালেঞ্জ কাপে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন! হকির প্রথম আন্তর্জাতিক সাফল্যে আন্দোলিত হয়েছিল গোটা দেশ।

অনেক খাঠ-খড় পুড়িয়ে সাফল্য আসে। কিন্তু সাফল্য আসার পর কর্তাব্যক্তিদের আর মানা ঠিক থাকে না। যে জন্য তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করে। ক্রিকেটে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশকে বিশ্বকাপের আসরে পৌঁছে দেয়। গর্ডন গ্রিনিজ আর ফুটবলে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানো জর্জ কোটানকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বেলায়ও একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই বোধহয় সে সুযোগ না দিয়ে নীরবে সরে গেলেন কামার।

কামারের এই নীরবে চলে যাওয়া নিয়ে গত কয়েক সপ্তায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শামসুল বারীও বলেছেন তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার কথা। কামার নিজেও স্বীকার করেছেন তা, 'ফেডারেশন থেকে আমি একটা মেইল পেয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় না ফিরে গিয়ে আগের সেই নিবেদিতপ্রাণ নিয়ে কাজ করতে পারবো। ওটা করতে হলে আমার আর ফেডারেশনের মধ্যে তো পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। এই বিষয়টির সামনে এখন বড় এক প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে। এসব কারণে যদি সেরাটা দিতে না পারি তাহলে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মতো লোক আমি নই, তার চেয়ে না ফেরাই ভালো।' বাংলাদেশের জন্য তবু হাতটা বাড়ানোই থাকছে কামারের। কারণ বড় বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন এ দেশের তরুণ হকি তারকাদের। কামারের খেদটা তাই চাপা থাকে না, 'বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের হকির জন্য আমার শুভেচ্ছা সব সময়ই থাকবে। বিশ্বাস করুন, আমার ছেলেগুলোর যখনই কোনো সহায়তা দরকার তাদের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টাটাই করব আমি।' পেছনে ফেলে আসা তারুণ্যকে যেন মাত্র কয়েক মাসেই বাংলার হকি তারকাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন কামার। সেই তাদেরই ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট বেজে ওঠে কামারের কণ্ঠে, 'ছেলেগুলোর কথা ভাবলে চোখে পানি এসে যায়। কষ্ট হবেই বা না কেন। দারুণ ভালো শিক্ষার্থী, কঠোর পরিশ্রমী। তাদের জন্য আমি ছিলাম বন্ধু, শিক্ষক এবং বাবার মতো। আমি শতভাগ নিশ্চিত, গ্রেট খেলোয়াড় হওয়ার সক্ষমতাও আছে তাদের মধ্যে। কিন্তু তারা বড় দুর্ভাগা। ফেডারেশন থেকে সঠিক সমর্থনটা পাচ্ছে না।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে ই-মেইল এবং টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছে কামারের, যা থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক অজানা তথ্য।

কামারের চিঠি

এই প্রতিবেদককে একটি ই-মেইলে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন কামার। এখানে তার অনুবাদ পুরোপুরি তুলে ধরা হলো :

'সুহৃদ খাইরুল আমিন ভাই,

আপনি প্রতিশ্রুতি রাখবেন জেনে খুব ভালো লাগলো। এখন আপনাকে খুলে বলি আমার সঙ্গে যা কিছু ঘটেছে।

যতদিন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, ততদিন বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন (বিএইচএফ) আমাকে তেমন মর্যাদাই দেয়নি। ফেডারেশনের সবাই লাগাতার মিথ্যে বলে গেছে আমার সঙ্গে, এমনকি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘসূত্রতা করেছে। ব্যতিক্রম ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক, এ দুটি মানুষ আমার প্রয়োজনে এগিয়ে এসেছেন সবসময়।

আমার কাজ ও অন্যান্য বিষয় দেখভালের জন্য বিএইচএফ দুজন সমন্বয়কারী নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের একজন মনোয়ার হোসেন, অন্যজন আব্দুল রশীদ। মনোয়ার সব সময় মিথ্যে কথা বলেছে, সবকিছুতে সময় নষ্ট করেছে। এবার বাংলাদেশে আসার আগে পাকিস্তান থেকে তাকে ফোন করে আমার ফ্লাইটের বিস্তারিত জানালাম। কিন্তু সে বিমানবন্দরে নিতেই এল না। আমি একা একটি ট্যাক্সি নিয়ে বিকেএসপি গেলাম। তখনই তাকে বারবার ফোন করেছি, কিন্তু তার মোবাইল ছিল বন্ধ, জানি না কেন। আর আব্দুল রশীদের কথা কী বলব! আজ পর্যন্ত কখনোই তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, এমনকি একবারের জন্য ফোনেও কথা হয়নি!

আমার থাকার ব্যবস্থা করার কথা ছিল ইমপেরিয়াল হোটেলে জিপিওর উল্টোদিকে। ওখানে নির্মাণের কাজ চলছিল। আর হোটেলটি এমন জায়গায় যার পরের রাস্তায়ই বিরোধী দলের কার্যালয়, যেখানে একবার বোমাও ফেটেছিল। প্রেসিডেন্ট অবশ্য আমাকে কথা দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে ওখানে আমার থাকতে হবে না। কিন্তু কোথায় আর থাকা? বারবার মনে করিয়ে দিয়েছি, আবাসন নিয়ে অভিযোগ করেছি পর্যন্ত। কিন্তু তারা আমাকে উপেক্ষা করেই গেছে। বিকেএসপিতে এবারের টুর্নামেন্টটা শেষ করার পর ফেডারেশন এবং ম্যানেজারকে আমি অনুরোধ করেছিলাম ঢাকায় আমার থাকার ব্যবস্থা করতে। পরের সকালেই ওখানে আমার যাওয়ার কথা। সমন্বয়ক মনোয়ার এবং তাদের ফেডারেশনের আরো কয়েকজন আমাকে জানালো, হোটেল একেবারে কানায় কানায় ভরা, একটা রুমও খালি নেই। তার একদিন পর ঢাকায় এসে উঠলাম ওই হোটেলেই। হোটেল ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকেই জানা গেল, আগের দিন তাদের পুরো ফ্লোরটিই খালি ছিল। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না কেন তারা আমার সঙ্গে এমন করছিল, আর কেনইবা প্রত্যেকটি ব্যাপারে দিনের পর দিন মিথ্যে বলে চলছিল।

কথা ছিল ঢাকায় আসার পর বিএইচএফ আমাকে ড্রাইভারসহ একটি গাড়ি দেবে। কিন্তু বাংলাদেশে পৌঁছানোর ২০ দিন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। প্রত্যেক দিনই আমাকে অজুহাত দেয়া হতো, প্রত্যেক দিনই বলা হতো আগামীকাল অবশ্যই গাড়ি পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের 'আগামীকাল' এল ২০ দিন পর, তাও খোদ প্রেসিডেন্ট উদ্যোগী হওয়ায়।

বিকেএসপিতে তারা আমাকে আমার ট্রেনারের সঙ্গে থাকতে দিয়েছিল। ওখানে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। রাত আড়াইটার সময়ও আমরা দু'জন ব্যস্ত ছিলাম তেলাপোকা আর টিকটিকি মারতে। হতাশ হয়ে প্রেসিডেন্টকে অভিযোগ করার পর তারা শুধু আমার জন্য একটি রুমের ব্যবস্থা করল, ট্রেনার এরশাদ হায়দারের জন্য নয়। সেও তো একজন বিদেশী মানুষ। আমার প্রশ্ন, যে কোচের কোচিংয়ে বাংলাদেশের হকি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, ফাইনালে ভারতের মতো অনেক বেশি শক্তিধর দলকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো জিতেছে কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, সেই মানুষটির সঙ্গে এমন আচরণ করতে হয়? এরকম মর্যাদা দিতে হয়? খুব জানতে ইচ্ছে হয়, আমার সঙ্গে যেমন করা হয়েছে তেমন আচরণ ক্রিকেট কোচ ডেভ হোয়াটমোরের সঙ্গেও করা হয় কি না।

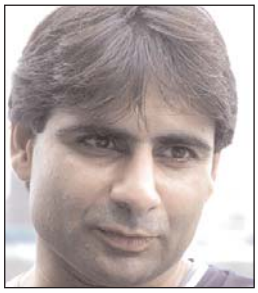

১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলা এই রাইট উইঙ্গার ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন, গোল করেছেন ৩৪টি। বিশ্বকাপে রূপা জিতেছেন, দুটি অলিম্পিকের একটিতে ব্রোঞ্জ। টানা ৫টি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলে দুটি রুপা এবং ১টি ব্রোঞ্জ তার অর্জন

বেতনের কথায় আসি। এই বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপণের যেন শেষ ছিল না। ৮ মাস পর বেতন পেয়েছিলাম আমরা। আর তা সম্ভব হয়েছিল শুধু এ কারণেই যে, ফেডারেশন প্রেসিডেন্ট ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং যথাসম্ভব দ্রুত আমাদের টাকা দিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সত্যি বলতে, এই মানুষটি আমাদের সঙ্গে খুবই ভালো আচরণ করেছেন। শুধু তারই কারণে আমার চলে আসতে এত দেরি হয়ে গেল, আমি চেষ্টা করেছিলাম মানিয়ে নিতে। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হলো যেদিন, সেদিনই তার কাছে আমার পদত্যাগপত্র দিয়ে দিয়েছিলাম। তার অনুরোধেই সেই পত্র আমি ফিরিয়ে নেই।

কিন্তু বিকেএসপি থেকে ফিরে আসার পর দেখলাম কিছুই বদলায়নি, সবই সেই আগের ঢঙে চলছে। চুক্তি অনুসারে প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বিএইচএফের বেতন পরিশোধ করার কথা। সমন্বয়কারীকে সে কথা ২০০৫-এর ৩ আগস্ট থেকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল এরশাদ হায়দার। তারপর তো ১৩ আগস্ট আমরা চলেই এলাম। কী করার ছিল? এবারও আগের মতো মিথ্যে বলতে শুরু করলো তারা, নানা অজুহাত দিতে থাকলো। তারা কী মনে করে আমাদের? বারবার, প্রত্যেকবার আমাদের অনুরোধ করতে হবে? না, দুঃখিত। এরচেয়ে ভালো পদত্যাগ করা, সরে যাওয়া। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল দেখে আমরা সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললাম।

এই হলো আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যার কিছু। এবার আসুন বাংলাদেশের হকি প্রসঙ্গে।

আগে বাংলাদেশ হকি দলের অনুশীলন হতো দেড় ঘণ্টার মতো। কিন্তু আমি এসে এই অনুশীলন নিয়ে গেলাম সাত ঘণ্টায়- সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টা, বিকেলে সাড়ে তিন ঘণ্টা। বিশ্ব বা এশিয়ান পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। আমার খুব অনুরোধের পর পাওয়া গেল কিছু সুযোগ-সুবিধা আর খেলোয়াড়দের খাওয়া-দাওয়া। এমনকি অনুশীলনের ফাঁকে খেলোয়াড়দের পান করতে দেওয়ার জন্য সাধারণ অরেঞ্জ এনার্জেটিক ড্রিঙ্কের জন্যও আমার লড়াই করতে হয়েছে।

আমি নিজে পাকিস্তান উড়ে গিয়ে হকিস্টিক, বল, স্যু এবং খেলার সামগ্রী নিয়ে এসেছি যতোটা সম্ভব ডিসকাউন্টে। এটা তো আমার কাজ ছিল না। তারপরও আমি তা করেছিলাম বাংলাদেশের হকির কথা ভেবে, করেছিলাম যাতে খেলোয়াড়রা ভালো পারফর্ম করতে পারে।

অনূর্ধ্ব-২১ চ্যালেঞ্জ কাপ আমরাই জিতলাম ভারতকে হারিয়ে। ওই টুর্নামেন্টের ট্রেনিং ক্যাম্প চলার সময় আমার খেলোয়াড় আর স্থানীয় কোচরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে। প্রত্যেকটি ট্রেনিং সেশন ছিল খুব পরিশ্রমের। তাদের বলেছিলাম, একবার শুধু জয় এনে দাও আমাকে, ফেডারেশনের কাছ থেকে আমি তোমাদের জন্য আদায় করে দেব সর্বোচ্চ সমর্থন ও সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু কষ্টই লাগছে এ কথা জানাতে যে, খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২০ হাজার টাকা, স্থানীয় কোচদের সামান্য পুরস্কারও দেওয়া হয়নি। এবার বলো, যে কোচদের আমি কোচিং করাচ্ছি তারাই তো দেশের ভবিষ্যৎ হকির জন্য কাজে আসবে। সেই তাদেরই এভাবে উপেক্ষা করলে হকির ভবিষ্যৎ কোথায়?

হকি নিয়ে ফেডাশেনের আসলে কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও নেই। যে দলটি জিতল সেটিকে অনুশীলনে ব্যস্ত রাখার কথা বলেছিলাম

‘এভাবে তো কেউ চলে যেতে পারে না। আমরা তো তাকে পরিকল্পনা করতে বলেছিলাম’

-শামসুল বারী

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন

২০০০ : জানা গেছে, হকি ফেডাশেন থেকে যথেষ্ট সমর্থন না পাওয়াও কামারের চলে যাওয়ার পেছনের কারণগুলোর একটি।

শামসুল বারী : এটা তো নতুন কোনো কথা নয়। তাকে হয়তো যথেষ্ট সমর্থন দিতে পারিনি আমরা, তাই বলে চলে যেতে হবে নাকী?

২০০০ : তার মানে বলতে চাইছেন একজনকে কাজ করতে বলে তাকে ঠিকঠাক সমর্থন না দিলেও তার থাকতে হবে!

শামসুল বারী : আগেও বলেছি, অনেক কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমি এখন ফেডারেশনে নই, বাইরে আছি। এ নিয়ে কথা বলতে হলে অনেক কিছু বলতে হবে। তার চেয়ে আপনি কাল ফোন করুন, বা ফেডারেশনে আসুন, বসে কথা বলি।

২০০০ : খুব বেশি সময় নয়, মাত্র কয়েকটা মিনিট। কিছু পয়েন্ট নিয়ে কথা বলা যাক।

শামসুল বারী : ঠিক আছে বলুন।

২০০০ : কামার চেয়েছিলেন, গত অক্টোবরে যে দলটি ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো সে দলটি খেলার মধ্যে থাকুক। তার চাওয়া ছিল বিদেশী দল এনে কিংবা দলকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে খেলার মধ্যে রাখা হোক। আপনারা সেটা করেননি।

শামসুল বারী : হ্যাঁ, সেটা করা হয়নি। কিন্তু কামারকেই তো পাইনি। ও তো চলে গেল দেশে। তাছাড়া ওকে তো আমরা বললাম, ঠিক আছে কীভাবে কী করতে হবে সব পরিকল্পনা আমাদের দিন। তা না করেই তো চলে গেল।

২০০০ : আপনারা সেটা তো বলেছেন এই জুলাইয়ে, তার আগে তো নয়।

শামসুল বারী : তার আগে তাকে পাওয়া যায়নি তো।

২০০০ : ফেব্রুয়ারিতে তো তিনি এসেছিলেন কোচদের কোর্স করাতে। তখনো তো উদ্যোগ নেননি।

শামসুল বারী : তা হয়নি বলে এভাবে তো কেউ চলে যেতে পারে না। আমরা তো তাকে পরিকল্পনা করতে বলেছিলাম। সব কিছু প্ল্যান পোগ্রাম হয়ে গেছে তখন তো আর চলে যাওয়া যায় না।

২০০০ : কিন্তু এও জানা গেছে যে, প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও আপনারা ছয় মাসের বেতন দিয়েছেন এই সেদিন, জুলাইয়ে।

শামসুল বারী : বেতন নেওয়ার জন্য তাদের তো পেতে হবে।

২০০০ : কেন, ফেব্রুয়ারিতে তো এসে বেশ কিছুদিন থেকে গেছেন, তখনো তো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

শামসুল বারী : তখন আসলে কিছু সমস্যা ছিল। আমি অসুস্ত ছিলাম, পুশকিন (প্রয়াত কর্মকর্তা) ব্যস্ত ছিল। আর বেতন তো তোলা হয়নি।

২০০০ : এটা কী কোনো কারণ হতে পারে যে আপনি অসুস্থ্য ছিলেন, পুশকিন ব্যস্ত ছিলেন তাই বেতন দেওয়া যায়নি? আপনারা দুজন তো ফেডারেশন নন, বেতন দেওয়ার জন্য ফেডারেশন আছে।

শামসুল বারী : এটা খুবই দুর্বল অভিযোগ যে বেতন না দেওয়ায় তারা চলে গেছে। তাছাড়া এতদিন বেতন তোলা হয়নি।

২০০০ : কাউকে কাজ করাবেন, বেতন দেবেন না, তারপরও তাকে থাকতে হবে! তারা চলে গেলেন আগস্টের ১৩ তারিখ, জুলাইয়ের বেতনও তো দেননি।

শামসুল বারী : তা হয়নি বলে চলে গেছে, এমনটা নয়। (অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন শামসুল বারী)।

২০০০ : তাহলে আপনাদের কী ধারণা, কেন চলে গেলেন কামার?

শামসুল বারী : সেটা আমি কীভাবে বলব? তাকেই জিজ্ঞেস করুন। আমরা তার কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছি।

২০০০ : কিন্তু কামারের এই চলে যাওয়াতে কী আপনাদের ব্যর্থতাই প্রমাণিত হয় না?

শামসুল বারী : আমি আসলে এখন ব্যস্ত আছি, স্যরি আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে পারবো না। (কথাটা শেষ করেই ফোন কেটে দেন তিনি।)

আমি। আরো বলেছিলাম, তাদের বিদেশে পাঠিয়ে বা বিদেশী দলকে বাংলাদেশে এনে খেলার মধ্যে রাখতে, এক্সপোজার দিতে। কিন্তু কিছুই হলো না। অনূর্ধ্ব-২১ চ্যালেঞ্জ কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ফেডারেশনের কাছে জানতে চাইলাম, এবার কী করব? আমাকে জানানো হলো, টাকা-পয়সার সংকট দেখা দিয়েছে, অনূর্ধ্ব-২১ টুর্নামেন্টের খরচের অডিট চলছে, সুতরাং কিছু করার মতো অবস্থা নেই। অপেক্ষা করতে হবে।

তারও পরে ফেব্রুয়ারিতে আমি বাংলাদেশে গেলাম একটি কোচিং কোর্স করাতে। ওই কোর্সের সময়, আগে ও পরে মির্জা ফরিদ ছাড়া ফেডারেশনের আর কেউ সেখানে ছিল না। মির্জা ফরিদকেই জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কী করতে হবে? তিনি বললেন, তার জানা নেই। তখন শামসুল বারীর এক চোখে অপারেশন হয়েছে, তার মা মারা গেছেন। কর্মকর্তাদের অন্যদের মধ্যে পুশকিন ফুটবল খেলোয়াড় মুন্নাকে নিয়ে হাসপাতালে ব্যস্ত ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্টকে ফোন করলাম। পুরো পরিস্থিতি তাকে ব্যাখ্যা করে জানালাম, এখানে আসলে কোনো কাজই নেই। সর্বশেষ তিন-চার দিনে স্টেডিয়ামে গিয়ে দুপুরের খাবার খাওয়া আর কয়েক কাপ চা পান করা ছাড়া যে কিছুই করার ছিল না তাও বললাম। প্রেসিডেন্টেরই অনুমতি নিয়ে আমি ফিরে গেলাম পাকিস্তানে।

ভাই খাইরুল আমিন,

আমার মনে হয় না এই রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলতে থাকলে বাংলাদেশের হকির কোনো উন্নতি হবে। আরো কিছু বিষয় আছে যা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে অনেক কিছুই আর মনে নেই।

পদত্যাগের পেছনের গল্পটা কামার প্রথমে কিছুতেই বলতে চাইছিলেন না। কয়েকটি মেইলের পর জানালেন, যদি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তাকে উদ্ধৃত করা হবে না তাহলে তিনি জানাতে পারেন বিস্তারিত। কারণ, হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বিমান বাহিনীর প্রধান ফখরুল আজম এবং সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শামসুল বারীর সমর্থনটা মনে আছে তার। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সব জেনে সেই প্রতিশ্রুতি রাখা যায়নি, দুঃখ প্রকাশ করতে হচ্ছে তার কাছে। তাকে জানানোও হয়েছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে। কারণ তার পদত্যাগের পেছনের গল্পে আছে বাংলাদেশের হকির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা, কাজের পরিবেশ না পাওয়ার হতাশা, ফেডারেশনের অক্ষমতা, খেলোয়াড়দের দুর্ভাগ্যের কথা, স্থানীয় কোচদের আশাভঙ্গের গল্প এবং আরো অনেক ফাঁক-ফোকড়। সাফল্য এলে তাকে ধরে রাখতে নতুন করে যত্ন-আত্মি করতে হয়। সবাই তা বুঝলেও বুঝলো না শুধু হকি ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তিরা। হকি ফেডারেশনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর সময় কিন্তু এখনই।